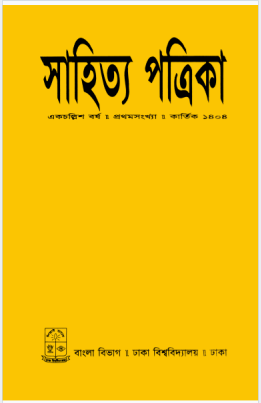

Vol. 41 | No. 1 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বেগম রোকেয়ার শিক্ষা-সমাজ বিষয়ক চিন্তা ও কর্ম

Volume	41
Issue	1
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবদুল মালেক
Published online	October 1, 1997
DOI	10.62328/sp.v41i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v41i1.3
Pages	52-72
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বেগম রোকেয়ার শিক্ষা-সমাজ বি

Check for updates

আবদুল মালেক*

উনিশ শতকের শেষ ভাগের মধ্যে উপমহাদেশের সমাজব্যবস্থায় ব্রিটিশ শাসনের নানারূপ ফলাফল প্রতিফলিত হয়। শত শত বছরের একমাত্রিক সমাজ প্রবাহের অধিকারী এশীয় এ সমাজে পরিবর্তনের নানাবিধ ধারা সৃষ্টি হয়। বাঙালি সমাজেরও সাধিত হয় কিছু উল্লেখযোগ্য সংস্কার। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ মনীষীর প্রচেষ্টায় বাঙালি হিন্দু সমাজে পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য ধারা সূচিত হয়। গড়ে ওঠে 'আত্মীয় সভা', 'ইণ্ডিয়ান ল কমিশন', 'তত্ত্ববোধিনী সভা', 'ইয়ং বেঙ্গল', 'ইণ্ডিয়ান রিফর্ম এসোসিয়েশন' প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন। বাঙালি মুসলমান সমাজ তখনও বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ মনীষীর প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে 'মহমেডান লিটারেরি সোসাইটি' এবং 'ন্যাশনাল মহমেডান এসোসিয়েশন'। কিন্তু এসব মনীষী ও তাঁদের গড়া প্রতিষ্ঠান বাঙালি মুসলমান সমাজে তেমন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারেনি, যেমন পেরেছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ বাঙালি হিন্দু সমাজে।

অনেকে এসব ঘটনাকে বাঙালি সমাজের 'রেনেসাঁস' হিসেবে আখ্যাত করেছেন। কিন্তু ইউরোপীয় 'রেনেসাঁস'-এর মানদণ্ডে তা বলা চলে না।[১] এসব সংস্কারের ফলাফল তখনও আপামর জনসাধারণের দুয়ারে পৌঁছেনি। হাজার হাজার বছর ধরে বাঙালি সমাজে যে 'কৌলিক সংকীর্ণতা' বিদ্যমান ছিল তার মাত্রা তখনও তেমনভাবে কমে আসেনি। বিশেষত নারী পরাধীনতার প্রকট রূপটিতে পরিবর্তনের ছোঁয়া তেমন লাগেনি। বাঙালি মুসলিম সমাজে এ ক্ষেত্রটি শত শত বছরের রীতি-প্রথার কঠিন-কঠোর আবরণ দ্বারা আবদ্ধ ছিল। এমনি কৌলিক ও সামাজিক পরিবেশে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (যিনি বেগম রোকেয়া নামে সমধিক পরিচিত) ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার এক মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

---

* সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১. বদরুদ্দীন উমর, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ*, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৫

বেগম রোকেয়ার পৈত্রিক পারিবারিক পরিমণ্ডল ও পরিবেশ থেকে তৎকালীন বাঙালি অভিজাত মুসলিম সমাজের প্রকৃতি বহুলাংশে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বেগম রোকেয়া তাঁর রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামের পিতৃগৃহের পরিবেশ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "আমাদের এ নিবিড় অরণ্যবেষ্টিত বাড়ির তুলনা কোথায়? সাড়ে তিনশত বিঘা লা-খেরাজ জমির মাঝখানে কেবল আমাদের এই সুবৃহৎ বাটী। বাড়ির চতুর্দিকে গভীর বন, তাহাতে বাঘ, শূকর, শৃগাল - সবই আছে। আমাদের এখানে ঘড়ি নাই, সেজন্য আমাদের কোন কাজ আটকায় না। প্রভাতে আমরা 'ঘু-ঘু', 'বউ কথা কও', 'ও খুকি ও খুকি' 'চোক গেল' প্রভৃতি পাখির ভৈরবী আলাপে শয্যাত্যাগ করি। সন্ধ্যাকালে শৃগালের 'হুয়া হুয়া ক্যা হুয়া' শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারি, মগরেবের নামাজের সময় হইয়াছে। রাত্রিকালে কুরুয়া পাখীর 'কা-আক্-কা-আক্-কু' ডাক শুনিয়া বুঝিতে পারি, এখন রাত্রি তিনটি।"[২] বাড়ির প্রাকৃতিক ও জড় পরিবেশের এরূপ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত ছিল সামাজিক পরিবেশ। ঘনীভূত অবরোধ প্রথা ছিল এ সামাজিক পরিবেশের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। বেগম রোকেয়া লিখেছেন, " ..... সবেমাত্র পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আমাকে স্ত্রীলোকদের হইতেও পর্দা করিতে হইত। ছাই কিছুই বুঝিতাম না যে, কেন কাহারও সম্মুখে যাইতে নাই ; অথচ পর্দা করিতে হইত। পুরুষদের ত অন্তঃপুরে যাইতে নিষেধ, সুতরাং তাহাদের অত্যাচার আমাকে সহিতে হয় নাই। কিন্তু মেয়ে মানুষের অবাধ গতি - অথচ তাহাদের দেখিতে না দেখিতে লুকাইতে হইবে। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াইতে আসিত ; অমনি বাড়ির কোন লোক চক্ষুর ইসারা করিত, আমি যেন প্রাণ ভয়ে যত্রতত্র-কখনও রান্নাঘরে ঝাঁপের অন্তরালে, কখনও কোন চাকরাণীর গোল করিয়া জড়াইয়া রাখা পাটির অভ্যন্তরে, কখনও তক্তপোষের নীচে লুকাইতাম।"[৩] এ প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন,"বাচ্চাওয়ালী মুরগী যেমন আকাশে চিল দেখিয়া ইঙ্গিত করিবার মাত্র তাহার ছানাগুলি মায়ের পাখার নীচে পলায়, আমাকেও সেইরূপ পলাইতে হইত। কিন্তু ছানার ত মায়ের বুক স্বরূপ একটি নির্দিষ্ট আশ্রয় থাকে, তাহারা সেইখানে পলাইয়া থাকে ; আমার জন্য সেরূপ কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থান ছিল না। আর মুরগীর ছানা স্বভাবতঃই ইঙ্গিত বুঝে - আমার ত সেরূপ কোন স্বাভাবিক ধর্ম (instinct) ছিল না। তাই কোন সময় চোখের ইশারা বুঝিতে না পারিয়া দৈবাৎ পলাইয়া যদি কাহারও সম্মুখীন হইতাম, তবে হিতৈষিণী মুরব্বিগণ, 'কলিকালের মেয়েরা কি বেহায়া, কেমন বেগয়রৎ' ইত্যাদি বলিয়া গঞ্জনা দিতে কম করিতেন না।"[৪] সামাজিক পরিবেশের এই

---

২. আবদুল কাদির সম্পাদিত, *রোকেয়া রচনাবলী*, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ১৯৫-১৯৬

৩. ঐ, পৃ. ৪৮৮-৪৮৯

না।"[৪] সামাজিক পরিবেশের এই যে অবরুদ্ধ অবস্থা তা শুধু রোকেয়ার পিতৃ পরিবারে ছিল না, মুসলিম সমাজের সর্বত্র বিশেষ করে আশরাফ মুসলমান সমাজে বিরাজমান ছিল। এক্ষেত্রে রোকেয়ার আর একটি বক্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি উল্লেখ করেছেন, "আমার পঞ্চম বর্ষ বয়সে কলিকাতা থাকাকালীন আমার দ্বিতীয়া ভ্রাতৃবধূর খালার বাড়ী – বোহার হইতে দুইজন চাকরানী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। তাহাদের 'ফ্রী পাশপোর্ট' ছিল, – তাহারা সমস্ত বাড়িময় ঘুরিয়া বেড়াইত, আর আমি প্রাণভয়ে পলায়নমান হরিণ শিশুর মত প্রাণ হাতে লইয়া যত্রতত্র – কপাটের অন্তরালে কিম্বা টেবিলের নীচে পলাইয়া বেড়াইতাম। ত্রিতলে একটি নির্জন চিল-কোঠা ছিল ; অতি প্রত্যুষে আমাকে কোলে করিয়া সেইখানে রাখিয়া আসিত ; প্রায় সমস্ত দিন সেইখানে অনাহারে কাটাইতাম। বোহারের চাকরানীদ্বয় সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিবার পর অবশেষে সেই চিল-কোঠারও সন্ধান পাইল। আমার এক সমবয়সী ভগিনী-পুত্র, হালু দৌড়াইয়া গিয়া আমাকে এই বিপদের সংবাদ দিল। ভাগ্যে সেখানে একটা ছাপরখাট ছিল, আমি সেই ছাপরখাটের নীচে গিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলাম – ভয়, পাছে আমার নিঃশ্বাসের সাড়া পাইয়া সেই হৃদয়হীন স্ত্রীলোকেরা খাটের নীচে উঁকি মারিয়া দেখে। সেখানে কতকগুলি বাকস্ পেটারা, মোড়া ইত্যাদি ছিল। বেচারা হালু তাহার (৬ বৎসর বয়সের) ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া সেইগুলি টানিয়া আনিয়া আমার চারিধারে দিয়া আমাকে ঘিরিয়া রাখিল। আমার খাওয়ার খোঁজ খবরও কেহ নিয়মমত লইত না। মাঝে মাঝে হালু খেলিতে খেলিতে চিল-কোঠায় গিয়া উপস্থিত হইলে, তাহাকেই ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা বলিতাম। সে কখনও এক গ্লাস পানি, কখনও খানিকটা 'বিন্নি' (খই বিশেষ) আনিয়া দিত। কখনও বা খাবার আনিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসিত না – ছেলে মানুষ ত, ভুলিয়া যাইত। প্রায় চারদিন আমাকে ঐ অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল।"[৫]

এ অবস্থায় সমাজে নারীর জীবনযাপন সম্পূর্ণতই ছিল আরোপিত। অর্জিত গুণের মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধন করার তেমন সুযোগ ছিল না। এমনকি, মেয়েদের পছন্দ অনুযায়ী লেখাপড়ার সুযোগ ও অধিকার ছিল না সেখানে। অভিভাবকেরা উর্দু, ফার্সি ও আরবি পড়ার অনুমতি দিলেও মাতৃভাষা বাংলা পড়ার অনুমতি দিতেন না। রোকেয়া উল্লেখ করেছেন, " .... আত্মীয়গণ আমার উর্দু ও ফারসী পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাংলা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন।"[৬] বেগম

---

৪. ঐ, পৃ. ৪৮৯
৫. ঐ. পৃ. ৪৮৯-৯০
৬. উদ্ধৃতি, মোতাহার হোসেন সুফী, *বেগম রোকেয়ার জীবন ও সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৯

রোকেয়ার পিতাও মেয়েদের বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষার প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন।[৭]

এরকম বদ্ধ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে লালিত-পালিত হলেও বেগম রোকেয়া নিজেকে এর বাইরে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি নিজের ব্যক্তিসত্তাকে বিকশিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সাথে সাথে নিজের মধ্যে আত্মসচেতন সত্তা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। আর "আত্মসচেতন সত্তা মাত্রই বড় কোন ক্ষেত্র, উচ্চতর কোন কোন আদর্শের জন্ম দিতে চায়।"[৮] এজাতীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষই নানা ক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। কারণ তাঁরা কৌলিক সীমাবদ্ধতাসম্পন্ন নিজেদের সামাজিক পরিমণ্ডল ভেদ করে, নিজেদের জাতি ও শ্রেণীগত-অবস্থান অতিক্রম করে সমাজে আপন আপন ভূমিকা নির্ধারণ করে নেন। বস্তুত "নিজ নিজ শ্রেণীর ভাবাদর্শে প্রত্যেকের ব্যক্তিমানস গড়ে উঠলেও, যে মানস পরবর্তী ধাপে সময়ের অগ্রসর চিন্তাপ্রবাহের সঙ্গে নিজের সত্তাকে যুক্ত করে নেয়, সেই মানসই ইতিহাস রচনা করে। বেগম রোকেয়া এরকমই একটি ঐতিহাসিক ব্যক্তিসত্তা।"[৯]

বেগম রোকেয়ার যে ব্যক্তিমানস তার কেন্দ্র ছিল সমাজ। সমাজ এবং তার কল্যাণ সাধন করাই ছিল তাঁর সকল চিন্তা ও কর্মের লক্ষ্য। তবে এক্ষেত্রে তিনি নারী-কল্যাণের কথা বেশি করে ভেবেছেন। নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা সবার উপরে তুলে ধরেছেন। নারীর মুক্তির কথা চিন্তা করেছেন। এখানে তাঁকে লিঙ্গ-কেন্দ্রিক এক সংকীর্ণ মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে দোষারূপ করা চলে না। নারী গোত্রের একজন হিসেবে নিজের সামগ্রিক বাস্তব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে নারীর প্রতি তাঁর সহমর্মিতা স্বাভাবিকভাবেই চলে এসেছে। সমাজে নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতিবন্ধকতা তাঁকে অহরহ পীড়া দিয়েছে। অবরোধ প্রথাকে তিনি সমাজে নারীর স্বকীয় ব্যক্তিত্ব বিকাশের সবচেয়ে বড় বাধা বলে চিহ্নিত করেছেন। বাঙালি সমাজে, বিশেষত বাঙালি মুসলিম সমাজে এ বাধার কারণে নারীর মর্যাদা ও ভূমিকা যথাযথ স্থান লাভ করতে পারছে না বলে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সর্বনাশ এ অবরোধ প্রথার কবল থেকে নারীকে রক্ষা করে সুস্থ ও বলিষ্ঠ এক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যই ছিল তাঁর সামগ্রিক চিন্তা ও কর্মের কেন্দ্রবিন্দু।

বেগম রোকেয়ার জীবৎকাল (১৮৮০-১৯৩২) বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিশ শতকের প্রথম দশকে তাঁর সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের উত্থান ঘটে। তাঁর চিন্তা-চেতনার প্রসারও ঘটে

---

৭. শামসুন নাহার মাহমুদ, *রোকেয়া জীবনী*, ঢাকা, ১৯৫৮, পৃ. ১৮

৮. বেগম আকতার কামাল, 'রোকেয়া-মানসের মূলসূত্র', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ৩৫ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৮৯, পৃ. ৪৩

৯. ঐ. পৃ. ৪৩

এ সময়ে। তখন থেকেই তিনি লেখিকা, সমাজকর্মী, শিক্ষাব্রতী প্রভৃতি নানামুখী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি আধুনিক, বাস্তববাদী, যুক্তিসিদ্ধ ও বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা-চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন সুস্পষ্টভাবে।

বাঙালি নারীর, বিশেষত বাঙালি মুসলিম নারীর মুক্তি সাধনই ছিল বেগম রোকেয়ার আরাধ্য বাসনা। নারীশিক্ষার বিস্তারকে তিনি এক্ষেত্রে চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য করেন। আর এ কাজকেই তিনি তাঁর জীবনের প্রধান কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেন। এজন্য মেয়েদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার কাজে তিনি জীবনের বেশির ভাগ কর্ম-সময় ব্যয় করেছেন। তবে এ কর্তব্যকাজের উৎসভূমিটি নিহিত রয়েছে তাঁর সাহিত্যচর্চার মধ্যে। তিনি সুদীর্ঘ তিন দশক কাল সাহিত্যচর্চা করেন। তেইশ বছর বয়সে এর যাত্রা শুরু হয় এবং মৃত্যুর আগের রাত্রি পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। এ সময়কালে তিনি পাঁচটি গ্রন্থ, ষোলটি প্রবন্ধ, ছয়টি ছোটগল্প ও রস রচনা এবং সাতটি কবিতা লেখেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্যচর্চা নিছক সাহিত্য সৃষ্টির লক্ষ্যে হয়নি। তারও মূল দিক ছিল সমাজ তথা নারী সমাজের হিতসাধন। "বাঙালি, বাঙালি মুসলমান, নারীশিক্ষা, নারীজাগরণ ঃ তাঁর ভাবনাশীলতা এইসবকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। ইস্কুল প্রতিষ্ঠা, নারী কল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা ঃ এইসব তাঁর কর্মের পরিধি। আর লেখিকা হিশাবে গল্প, কবিতা-উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেইসবের মধ্যে দিয়েও একটি উৎকাঙ্ক্ষাই তীব্র হয়ে প্রকাশ পেয়েছে ঃ নারীজাগরণ তথা সমাজহিত।"[১০] বস্তুত শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে নারীর সামাজিক উত্তরণের যে ব্রত রোকেয়া গ্রহণ করেছিলেন তাঁর অনুসঙ্গ হিসেবে তিনি সাহিত্যকর্ম করেছিলেন। 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদনে' বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।"[১১] বেগম রোকেয়ার লেখা প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদির ভাব ও প্রকরণ বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে, "অন্য উদ্দেশ্যে নয়ই, সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যও নয়, রোকেয়া লিখেছিলেন 'দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন' করবার জন্য।"[১২]

বেগম রোকেয়ার জীবৎকালের ঘটনাবলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর

---

১০. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বেগম রোকেয়া*, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১০
১১. উদ্ধৃতি, ঐ, পৃ. ৮৮
১২. ঐ, পৃ. ৮৮

শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা ও কর্মের প্রকৃতি এবং পরিধি নিজের সামগ্রিক জীবনবোধের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এজন্য তাঁর শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা ও কর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণে তাঁর জীবন পরিসরের কালক্রমিক পর্যালোচনা প্রয়োজন।

রোকেয়ার জীবনে রংপুর জেলার পায়রাবন্ধ গ্রাম ও কলকাতা শহর এবং বিহারের ভাগলপুর বিশেষভাবে জড়িত। পায়রাবন্ধ গ্রামে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্ম থেকে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে বিয়ে হওয়া পর্যন্ত ১৬ বছর কেটেছে। এজীবনে তিনি অনেক কিছু হারিয়েছেন, আবার অনেক কিছু পেয়েছেন। পিতৃ পরিবারের রুদ্ধ পরিবেশ তাঁর ব্যক্তিসত্তার স্বাভাবিক বিকাশে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে। আবার এর মধ্যেই তিনি তাঁর বড় ভাই ইবরাহিম সাবের এবং বড় বোন বেগম করিমুন্নেসার সহায়তা ও অনুপ্রেরণায় আধুনিক জ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়ে আলোর সন্ধান পান। এ আলোই তাঁকে ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

সার্বিক বিচারে একথা বলা চলে যে, বেগম রোকেয়ার জীবনের প্রধানতম যাত্রা শুরু হয় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে বিয়ের পর বিহারের ভাগলপুরে। একজন চিন্তাবিদ, লেখিকা এবং শিক্ষাব্রতী হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে এখানেই। এক্ষেত্রে তাঁর স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের প্রেরণা ও সহায়তা প্রধান 'অবলম্বন' ছিল। এ-সময়ে বেগম রোকেয়ার লেখা 'নিরীহ বাঙ্গালী' নামক প্রবন্ধটি সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত 'নবনূর' পত্রিকায় ১৩১০ সনের মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত ও পত্রিকায় প্রকাশিত এটিই তাঁর প্রথম রচনা। এ পত্রিকায় পরপর তাঁর আরও কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা 'বোরকা', 'স্ত্রীজাতির অবনতি', 'গৃহ' ও 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধগুলো এ পত্রিকায় যথাক্রমে ১৩১১ সনের বৈশাখ, ভাদ্র, আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। এগুলোর সাথে 'পিপাসা' ও 'সুগৃহিণী' নামে আরও দু'টি প্রবন্ধ নিয়ে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে 'মতিচূর' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এসব প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া নারীর সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য নারীকে যে বৈরি সামাজিক ফলাফল ভোগ করতে হচ্ছে সে বিষয়ে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বস্তুত জীবনের এপর্যায়েই শিক্ষা বিষয়ে তাঁর চিন্তার কাঠামোটি সৃষ্টি হয়ে যায়। 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর চিন্তা-মানস বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়। "বেগম রোকেয়া যদি আর কিছু না-ও লিখতেন, শুধু এই প্রবন্ধটি ছাড়া, আমরা এখানেই নারী-শিক্ষা বিষয়ে তাঁর চিন্তার সংবাদ পেয়ে যেতাম।"[১৩] নারীর

১৩. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, 'বেগম রোকেয়া ঃ নারী-শিক্ষা', *প্রণোদনা*, বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ১৮

শিক্ষার প্রশ্নে তিনি নারীর সামাজিক অবস্থান, অধিকার ও মর্যাদার কথা তুলেছেন। "প্রথমেই শিক্ষার প্রসঙ্গটা আসেনি, এসেছে সমাজে নারীর অবনতির এক ভয়াবহ বর্ণনা। নারীকে চিত্রিত করা হয়েছে দাসী হিসাবে।"[১৪] এই দাসত্ব থেকে নারীকে মুক্তি দেওয়াই ছিল রোকেয়ার শিক্ষাচিন্তার লক্ষ্য। এসময় নারী জাগরণের চিন্তা তার মধ্যে কতখানি ঘনীভূত হয়েছিল তা বুঝা যায় তাঁর Sultana's Dream (১৯০৮) রচনা থেকে। নারীর স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁর পরম দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটে এতে।

ভাগলপুরেই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়টি ঘটে। তা হলো ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে তাঁর স্বামীর মৃত্যু। স্বামীর মৃত্যু তাঁর জীবনকে উলট পালট করে দেয়। কিন্তু তিনি পরাজিত হননি। ইতোমধ্যে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে অবলম্বন করে তিনি তাঁর মূল লক্ষ্য সাধনের দিকে ধাবিত হন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, নারীশিক্ষা বিস্তারই ছিল বেগম রোকেয়ার জীবনের প্রধান কর্তব্য কাজ। স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরেই (অক্টোবর, ১৯০৯) তিনি ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষাকে তিনি গতানুগতিক দৃষ্টিতে শুধু চাকরি লাভের উপায় হিসেবে দেখেননি। শিক্ষাকে তিনি দেখেছেন মানুষের অন্তর্জাত শক্তির বিকাশের 'উপায়' হিসেবে। 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "শিক্ষার অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের 'অন্ধ অনুকরণ' নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা (faculty) দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি (develop) করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মনঃ এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্ত দ্বারা সৎকার্য করি, চক্ষু দ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন (বা observe) করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করি, এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি – তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল 'পাশ করা বিদ্যা'-কে প্রকৃত শিক্ষা বলি না।"[১৫] শিক্ষার মাহাত্ম্য তুলে ধরতে তিনি আরও বলেন, "যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু ধূলি, কর্দম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, সেখানে (বিজ্ঞানের) শিক্ষিত চক্ষু অনেক মনোরম চমৎকার বস্তু দেখিতে পায়। আমাদের পদদলিত যে কাদাকে আমরা কেবল মাটি, বালি, কয়লার কালি ও জলমিশ্রিত পদার্থ বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করি, বিজ্ঞানবিদ তাহা বিশ্লিষ্ট করিলে নিম্নলিখিত বস্তু চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইবেন। যথা – বালুকা বিশ্লেষণ করিলে সাদা পাথর বিশেষ (opal) ; কর্দম পৃথক করিলে চিনে বাসন প্রস্তুত

১৪. ঐ. পৃ. ১৮

করণোপযোগী মৃত্তিকা, অথবা নীলকান্তমণি ; পাথর, কয়লার দ্বারা হীরক এবং জল দ্বারা একবিন্দু নীহার ! দেখিলেন ভগিনি ! যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দম দেখে, সেখানে শিক্ষিত চক্ষু হীরা-মাণিক দেখে ! আমরা যে এহেন চক্ষুকে চির অন্ধ করিয়া রাখি, এজন্য খোদার নিকট কি উত্তর দিব ?"[১৫]

নারীকে তিনি এই 'প্রকৃত শিক্ষায়' শিক্ষিত করার কথা চিন্তা করেন। আর এজন্য তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন, "আমাদের শয়ন-কক্ষে যে সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল-কলেজ একপ্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন — কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি ?"[১৭] নারীর জন্য এই দ্বার উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই (১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ১লা অক্টোবর) তিনি ভাগলপুরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজের কল্যাণ সাধনের তীব্র বাসনা নিয়ে তিনি যা প্রতিষ্ঠা করেন তার স্বপক্ষে সমাজের কাছ থেকে তেমন সাড়া পেলেন না। অভিভাবকরা তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন না। বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। তা সত্ত্বেও তিনি মনে অটুট বল রেখে তা পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু অনাহত এক প্রতিবন্ধকতার কারণে ভাগলপুরে তাঁর পক্ষে বসবাস সম্ভব হলো না। তাঁর স্বপত্নীকন্যা ও জামাতা এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। ফলে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে তিনি বিহারের ভাগলপুর ছেড়ে কলকাতায় আসতে বাধ্য হন। বাকি জীবন তিনি কলকাতাতে অতিবাহিত করেন।

কলকাতায় আগমন তাঁর জীবনের পক্ষে শুভই হয়েছিল। এখানেই তাঁর সুপ্ত প্রতিভা পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করার সুযোগ পেয়েছিল।[১৮] রোকেয়ার সাহিত্যকর্মের বড় অংশই কলকাতাতে সম্পন্ন হয়। মতিচুর (২য় খন্ড), পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি কলকাতায় বসে রচনা করেন। শিক্ষাকর্মের প্রায় সবটুকুই পরিচালিত হয় কলকাতায়। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ তারিখে ভাগলপুর থেকে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' কলকাতার ১৩নং ওয়ালিউল্লাহ লেনের একটি বাড়িতে স্থানান্তর করেন। কলকাতায় স্কুলটি মাত্র আটজন ছাত্রী ও দু'খানা বেঞ্চ নিয়ে শুরু হয়। পরবর্তীকালে ছাত্রী সংখ্যা বাড়ায় এ গৃহে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ১৯১৩

---

১৫. *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. ২৭
১৭. ঐ. পৃ. ২৭
১৮. মোতাহার হোসেন সুফী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

খ্রিস্টাব্দের ৯ মে তারিখে স্কুলটি ১৩নং ইউরোপীয়ান এ্যাসাইলাম লেনে সরানো হয়। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে স্কুলটি উচচ প্রাইমারি বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং বছরের শেষে ছাত্রী সংখ্যা ৮৪তে দাঁড়ায়। ছাত্রী সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকায় ১৯১৫ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি এ স্কুল ৮৬/এ লোয়ার সার্কুলার রোডের ঠিকানায় স্থানান্তরিত হয়।[১৯] ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা ১০৫–এ পৌঁছায়।

কলকাতায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই রোকেয়া শিক্ষাবিস্তার কর্মের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। এ কারণে দীর্ঘদিন যাবত তাঁর সাহিত্যচর্চায় বিরতি ঘটে। লক্ষ্য করা যায় যে, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে 'Sultana's Dream' প্রকাশিত হওয়ার পর দীর্ঘ ব্যবধানে 'মতিচূর' (২য় খণ্ড) ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ সময় নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা প্রসারের গুরু দায়িত্ব মাথায় নিয়ে তাঁকে সামনের দিকে এগুতে হচ্ছিল। আর্থিক সংকট যেমন বড় বাধা ছিল, তেমনি সামাজিক নিন্দা–বিদ্রূপকেও মোকাবেলা করতে হচ্ছিল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই তাঁকে ধৈর্যের পরম পরীক্ষা দিতে হয়। স্কুলের জন্য তাঁর স্বামী প্রদত্ত দশ হাজার টাকা যে ব্যাংকে (বার্মা ব্যাংক) গচ্ছিত রাখেন সে ব্যাংক ফেল করায় সমস্ত টাকাই তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। সে সময়ে তাঁর যে দু'চারজন শুভাকাঙ্ক্ষী সহকর্মী ছিলেন, এ ঘটনায় তাঁরাও নিরাশায় ভেঙ্গে পড়েন। কিন্তু তিনি পরাজয় স্বীকার করে নেননি কখনও। এসময় তিনি নিজের টাকা থেকে ত্রিশ হাজার টাকা বিদ্যালয়ের জন্য দান করেন। বিদালয়ের পরিচালিকা হিসেবে তাঁর যে মাসোহারা বরাদ্দ ছিল সেটাও তিনি কোনদিনই নেননি।[২০] প্রথম দিকে বিদ্যালয়ের অনুকূলে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাও তিনি তেমন একটা পাননি। স্কুল প্রতিষ্ঠার বছরখানিক পরে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাস থেকে মাসিক ৭১ টাকার সরকারি সাহায্য জোটে। বহু চেষ্টার পর ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকে এ সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় মাসিক ৪৪৮ টাকায়। সে সময় মাসিক পৌনঃপৌনিক ব্যয় ছিল ৬০০ টাকা। সরকারি সাহায্যের অতিরিক্ত ১৫২ টাকা প্রতিমাসে সংগ্রহ করার জন্য তাঁকে সবসময় উদ্বিগ্ন থাকতে হতো।[২১] তাঁর চাচাতো বোন বেগম মরিয়ম রশীদকে লেখা একটা চিঠি থেকে তা বুঝা যায়। এ চিঠির এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন, "তোমার প্রেরিত কাসন্দ পেয়ে খুশী হয়েছি। বুয়া। তুমি কাসন্দ না দিয়ে যদি স্কুল ফান্ডে চার পাঁচটা টাকা পাঠাতে তাতে আমি বেশী সুখী

---

১৯. ঐ. পৃ. ৩৫

২০. মোশফেকা মাহমুদ, *পত্রে রোকেয়া পরিচিতি*, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ. ৪

২১. মুহাম্মদ শামসুল আলম, *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১১৫

হতুম। এক ব্যক্তি সুদূর রেঙ্গুন থেকে স্কুলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করে পাঠাচ্ছেন—গত মাসে ২৭৲ পাঠিয়েছিলেন। এবার ৬৯৲ পাঠিয়েছেন। আর তোমরা আমার আপন লোক হয়ে স্কুলটাকে ভুলে থাক।"[২২]

বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তাঁকে প্রতিনিয়ত হাঁড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হয়েছে। সাথে সাথে সমাজের বিদ্রূপকে হজম করতে হয়েছে। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে ঐ চাচাতো বোনকে লেখা রোকেয়ার চিঠির একটি অংশ থেকে তা আন্দাজ করা যায়। তিনি লিখেছেন, "চিঠি না লিখবার একমাত্র কারণ সময়াভাব। বুঝিতেই পারো এখন খোদার ফজলে পাঁচটি ক্লাশ এবং ৭০টি ছোট বড় মেয়ে, দু'খানা গাড়ী, দুই জোড়া ঘোড়া, সইস, কোচম্যান ইত্যাদি ইত্যাদি সবদিকে একা আমাকেই দৃষ্টি রাখিতে হয়। রোজ সন্ধ্যাবেলা সইসেরা ঠিকমত ঘোড়া মলে কিনা তাও আমাকে দেখিতে হয়। ভগিনীরে। এই যে হাড়ভাঙ্গা গাধার খাটুনী ইহার বিনিময় কি, জানিস?..... আমার হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পরিবর্তে সমাজ বিস্ফারিত নেত্রে আমার খুঁটিনাটি ভুলভ্রান্তির ছিদ্র অন্বেষণ করিতেই বদ্ধপরিকর।"[২৩]

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত উভয়বিধ মানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই শুধু ছাত্রী সংখ্যা বাড়ানো নয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বাড়ানোর প্রতিও রোকেয়া সমান আন্তরিক ছিলেন। এজন্য তিনি বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন, বিধি-ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে সুষ্ঠুভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এসব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতার ইংরেজ, বাঙালি নির্বিশেষে সকল অভিজ্ঞ ও কর্মদক্ষ মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ ও মেলামেশা শুরু করেন। ক্রমে তিনি কলকাতার মিসেস পি.কে. রায়, মিসেস রাজকুমারী দাস প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মহিলার সংস্পর্শে আসেন। মধুর ব্যক্তিত্ব, জ্ঞানানুরাগ ও কল্যাণ প্রচেষ্টা দিয়ে তিনি তাঁদের চিত্তজয় করেন। তাঁদের সহযোগিতায় কলকাতার বেথুন, গোখেল মেমোরিয়াল প্রভৃতি স্কুলে নিয়মিত যাতায়াত করে স্কুল পরিচালনার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগলেন দিনের পর দিন। এমন কি, ক্লাসে পড়া চলার সময় ছাত্রীদের সঙ্গে ক্লাস রুমের একপাশে তাঁকে বসে থাকতে দেখা যেত।২৪ বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য রোকেয়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপযুক্ত শিক্ষিকার অভাব অনুভব করেন। তিনি সরকারকে এ বিষয়ে লেখেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সরকারিভাবে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে কলকাতায়

---

২২. মোশফেকা মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১
২৩. ঐ. পৃ. ১৫
২৪. উদ্ধৃতি, মোতাহার হোসেন সুফী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

একটি মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করা হয়। এ স্কুল থেকে পাশ করা শিক্ষিকাগণ পরবর্তীকালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা নিযুক্ত হন। নারীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার এটাও একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নততর করার জন্য তদুপরি তিনি ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে শিক্ষয়িত্রী আনার চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "বাহিরে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীদিগকেও ক্রমাগত নিজের হাতে গড়িয়া লইতে হইয়াছে। স্কুলের জন্য 'জগৎ ছানিয়া কি দিব আনিয়া'–এভাবে প্রাণপণ যত্ন করিয়া মাদ্রাজ, গয়া, আগ্রা প্রভৃতি নানা স্থান হইতে শিক্ষয়িত্রী আনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।"[২৫]

জীবনের প্রধান করণীয় কাজ হিসেবে বিদ্যালয় পরিচালনার বিষয়ে তিনি কতখানি আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান ছিলেন তাঁর প্রমাণ বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়। বেগম রোকেয়ার ছাত্রী ও পরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা আনোয়ারা বাহার চৌধুরী উল্লেখ করেছেন, "কাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় পেয়েছি যখন দেখেছি স্কুলের শেষ গাড়ীটি চলে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেছেন। খোঁজ খবর নিয়েছেন সেদিনের সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা। অনেক রাত অবধি তিনি লেখাপড়ায়ও ব্যস্ত থাকতেন।"[২৬] বিদ্যালয়ের জন্য তিনি প্রতিদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। বিশ্রম বা আরাম ভোগ করার অবকাশ তাঁর ছিল না। প্রতিদিনই নতুন নতুন উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে তিনি স্কুলের কাজ করে যেতেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে এ বিষয়ে প্রমাণ মেলে। তিনি লিখেছেন, "আত্মীয়-স্বজনের মমতা কি মধুর জিনিষ তা আমার মত আত্মীয় হারা না হওয়া পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারবে না। শুনেছি, লোকে বেহেশতে গিয়েও নাকি আত্মীয় স্বজনের বিরহে ব্যাকুল হবে। কিন্তু বোন গ্রীষ্মাবকাশে আমার তো কোথাও যাবার যো নাই। এই যে স্কুল সংক্রান্ত রাশিকৃত office work - এগুলো করবে কে? সুতরাং বেহেশতের নিমন্ত্রণ পেলেও তো স্কুল ছেড়ে যেতে পারব না।"[২৭]

বেগম রোকেয়ার এ জাতীয় নিষ্ঠা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে 'মধ্য ইংরেজি' বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে স্কুলটি 'উচ্চ ইংরেজি' বিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। এ বিদ্যালয়কে তিনি নিজের

---

২৫. শামসুন নাহার মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২-৪৩

২৬. আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, 'বেগম রোকেয়াকে যেমন দেখিছি', *সংবাদ*, ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯

২৭. মোশফেকা মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

জীবনের সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে নিয়ে ছিলেন যে "ইঁহার জীবনের অন্য সাধনা ও প্রচেষ্টার কথা ছাড়িয়া দিলেও শুধু এই স্কুলের জন্যই মুসলমান সমাজ ইঁহার নিকট চিরঋণী হইয়া থাকিবে।"[২৮] বর্তমানে স্কুলটি সচল অবস্থায় কলকাতার ৯ নং লর্ড সিংহ রোডে অবস্থিত রয়েছে।

এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে রোকেয়াকে নানারূপ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং বিদ্রূপ ও কুৎসার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান সমাজের একটি অংশ তাঁর এই মহান প্রচেষ্টাকে বিনষ্ট করে দেবার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। রোকেয়ার আশা ছিল কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা স্কুল পরিচালনায় তাঁকে সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই এ ব্যাপারে তাঁকে সহযোগিতা করেননি, বরঞ্চ তাঁর সাথে বৈরী আচরণ করেছেন। অনেকে স্কুল প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছেন এবং কুৎসা রটনা করেছেন। তাঁর নামে এমনও অপবাদ দেয়া হয়েছিল, "যুবতী বিধবা স্কুল স্থাপন করিয়া নিজের রূপ-যৌবনের বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছেন।"[২৯] এ অবস্থাতেও তিনি শক্ত মনোবল ও গভীর নিষ্ঠার সাথে তাঁর আরাধ্য কাজ করে গেছেন। দীর্ঘ দিন স্কুল পরিচালনা করে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন, "এই আঠারো বৎসর ধরিয়া এই গরীব স্কুলকে জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য কেবল সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। দেশের বড় বড় লোক - যাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিতে রসনা গৌরববোধ করে, তাঁহারাও প্রাণপণে শত্রুতা সাধন করিয়াছেন। স্কুলের বিরুদ্ধে কতদিকে কত প্রকার ষড়যন্ত্র চলিতেছে, তাহা একমাত্র আল্লাহ জানেন। আর কিছু কিছু এই দীনতম সেবিকাও সময় সময় শুনিতে পায়।"[৩০] এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, "স্কুলটা যে এত ঝঞ্ঝাগত, এত শিলাবৃষ্টি, এত অত্যাচার সহিয়া এখনও টিকিয়া আছে, তাহাই যথেষ্ট। একথা বলি না যে, আমরা সমাজের সম্মুখে অতি উচ্চদরের এক অদ্বিতীয় আদর্শ বিদ্যালয় উপস্থিত করিয়াছি। আমাদের ন্যায় অবরোধ-বন্দিনীদের পক্ষে যতটা করা সম্ভব তাহাই করিয়াছি এবং অবরোধ-বন্দিনী বালিকাদের পক্ষে যতটা শিক্ষা পাওয়া সম্ভব, তাহাই তাহারা পাইয়াছে।"[৩১] তৎকালীন সমাজে বিরাজমান কঠোর পর্দা ও অবরোধ প্রথার কারণে মুসলিম মেয়েরা পাঁয়ে হেঁটে স্কুলে আসতে পারতো

---

২৮. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬
২৯. শামসুন নাহার মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩
৩০. ঐ. পৃ. ৫৩
৩১. ঐ. পৃ. ৫৪

না। এ কারণে রোকেয়াকে তাদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু সেখানেও তাঁকে দু'ভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। একদল অভিভাবক এ গাড়িকে 'Moving Black Hole (চলন্ত অন্ধকূপ)'[৩২] হিসেবে আখ্যাত করে এ ধরনের গাড়িতে করে স্কুলে মেয়েদের পাঠানো বন্ধ করে দেবেন বলে জানান। আর একদল এ গাড়ির পর্দা ব্যবস্থা ভাল না বলে 'এরূপ বেপর্দা গাড়ীতে কি করিয়া মেয়েরা আসে'[৩৩] তা দেখে নেবেন এবং তৎকালে প্রকাশিত 'খবিছ', 'পলীদ' প্রভৃতি উর্দু দৈনিক পত্রিকায় স্কুলের কুৎসা রটনা করবেন বলে শাসিয়ে রোকেয়ার নিকট পত্র লেখেন। এ অবস্থাকে তিনি উভয় সংকট হিসেবে আখ্যাত করে বলেছেন, "না ধরিলে রাজা বধে,— ধরিলে ভুজঙ্গ।"[৩৪]

সমাজে নারী জীবনযাপন তখন কতখানি অসহনীয় ছিল তা তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর পরিণত বয়সে লেখা 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থে। সামাজিক এ পরিস্থিতিতে তিনি দুঃখ করে বলেছেন, "কেন আসিলাম হায়! এ পোড়া সংসারে, কেন জন্ম লভিলাম পর্দা-নশীন ঘরে!"[৩৫] এখানে তাঁর নারী হৃদয়ের হাহাকার প্রকাশ পেয়েছে। সমাজের তাবৎ নারীর প্রতি তাঁর এক গভীর মর্মবেদনা ফুটে উঠেছে। বাংলার আর এক নারী দরদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মর্মবেদনা থেকে উৎসারিত উচ্চারণের সাথে এর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। নারীর প্রতি, বিশেষত বিধবাদের প্রতি সমাজের হৃদয়হীন উদাসীনতা ও অমানবিক আচরণের পরিচয় লাভ করে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন, "হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।"[৩৬] বস্তুত সমাজ অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও হৃদয়াবেগের দিক থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাথে রোকেয়ার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে রোকেয়ার তুলনা আমার কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হয়। শুধু শিক্ষা ও সমাজ ভাবনায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে এঁরা পথিকৃৎ বলেই নয়, অসীম সাহস, চারিত্রিক দৃঢ়তা, চিন্তাজীবন ও কর্মজীবনের সমন্বয়—এসব দিক দিয়েও দু'জনের মধ্যে মিল আছে।.... সামাজিক বিরুদ্ধতায়, হিংসায়, সংকীর্ণতায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন দু'জনেই, কিন্তু পরাজয় স্বীকার করেননি।"[৩৭] পরাজয় না মানার মানসিকতার কারণেই হাজারো

---

৩২. *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. ৫১১
৩৩. ঐ. পৃ. ৫১২
৩৪. ঐ. পৃ. ৫১২
৩৫. ঐ. পৃ. ৫১২
৩৬. অশ্রুকুমার সিকদার ও দেবেশ রায় (সম্পাদিত), *বিদ্যাসাগর – নির্বাচিত রচনা* উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং, ১৯৭১, পৃ. ৫৭
৩৭. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও বিদ্রূপ মাথায় করে রোকেয়া বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন, আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এখানে তাঁর ব্যক্তিস্বার্থ কিছুই ছিল না। সবই করেছেন সমাজের মঙ্গলের জন্য। তিনি বলেছেন, "এই স্কুলটা না থাকলে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাই। তবে এ স্কুলের উন্নতি কেন চাই? চাই নিজের সুখ্যাতি বাড়াবার জন্য নয় ; চাই স্বামীর স্মৃতি রক্ষার জন্য নয় ; চাই, বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য। 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল' শব্দ দু'টির জন্য যদি স্কুলের অকল্যাণ হয়, তবে সাইন-বোর্ড থেকে ও শব্দ দু'টি মুছে ফেলা যাক। অবশ্য মুসলিম সমাজটাও টিকে থাকলে বা গোল্লায় গেলে আমার নিজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কারণ, আমার কোন বংশধর নাই যে, তাদের ভাবী দুর্দশার আশঙ্কায় আমি শঙ্কিত হব, কিম্বা তাদের দুষ্ক্রিয়া দেখে আমি লজ্জিত হ'ব। সুতরাং আপনারা বুঝতে পারছেন, এই স্কুল সম্বন্ধে মাথা ব্যথায় আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই। যাঁদের বংশধর আছে, যাঁদের ভবিষ্যৎ আছে, তাঁরা যদি সমাজটাকে রক্ষা করতে চান, তবে সমাজের মাতৃস্থানীয়রা এই বালিকা স্কুলটাকে একটা আদর্শ বিদ্যালয় রূপে গঠিত করুন।"[৩৮] তাঁর এই যে খেদোক্তি তা সমাজকে রক্ষার জন্য, সমাজের উন্নতির জন্য। সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি এমন উক্তি করেছেন জীবনের শেষ দিকে গিয়ে অর্থাৎ ১৩৩৮ সনে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় 'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম' শীর্ষক এক লেখায়।

সাথে সাথে একথাও উল্লেখ প্রয়োজন যে, কুৎসা-বিদ্রূপ, তিরস্কার পাওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন বিদগ্ধজনের কাছ থেকে তিনি প্রশংসা ও সহায়তা লাভ করেছিলেন তাঁর কাজের জন্য। এঁদের মধ্যে সরোজিনী নাইডু, লেডি চেমসফোর্ড, আগা খান, মৌলানা মোহাম্মদ আলী, নওয়াব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা, সৈয়দ হাসান ইমাম, আবদুর রসুল, স্যার আবদুর রহিম, স্যার এ.কে. গজনভী, এ.কে ফজলুল হক প্রমুখ রয়েছেন।[৩৯] ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর সরোজিনী নাইডু হায়দারাবাদ থেকে বেগম রোকেয়াকে একটি চিঠি লেখেন তাঁর কাজের প্রশংসা করে। তিনি লেখেন, "..... কয়েক বৎসর হইতে দেখিতেছি, আপনি কি দুঃসাহসের কাজ করিয়া চলিয়াছেন। মুসলমান বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আপনি যে কাজ হাতে নিয়াছেন এবং তাহার সাফল্যের জন্য দীর্ঘকালব্যাপী যে ত্যাগ সাধনা করিয়া আসিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। আপনার প্রতি আমার আন্তরিক

---

৩৮. ঐ. পৃ. ২১

৩৯. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯-১০০

সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যেই এই চিঠিখানা লিখিলাম।"[৪০] এ চিঠিতে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, "..... আজ সাময়িকপত্রে (Indian Ladies Magazine) আপনার স্কুলের বার্ষিক রিপোর্ট পড়িতেছিলাম। আপনার এই ভগ্নী দূর হইতে বরাবর আপনার আদর্শকে এবং আপনার কর্মময় জীবনকে কিরূপ শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া থাকে, তাহা জানাইবার জন্যই এই চিঠি। মুসলমান নারীদের কল্যাণের জন্য আপনি যে অক্লান্ত সাধনা করিতেছেন, বিধাতা করুন, তাহা জয়যুক্ত হউক।"[৪১] ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বড়লাট পত্নী লেডি চেমসফোর্ড সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল পরিদর্শন করেন এবং বেগম রোকেয়ার প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। উল্লিখিত ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য প্রতিতযশা ব্যক্তিবর্গ বিভিন্নভাবে বিদ্যালয়ের বিষয়ে বেগম রোকেয়াকে সহায়তা করেছেন। নানা রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এঁদের সমর্থন, সহায়তা, সহানুভূতি ও প্রশংসা বেগম রোকেয়াকে অনুপ্রাণিত করেছে। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করার পেছনে তাঁদের অনুপ্রেরণা রোকেয়াকে শক্তি যুগিয়েছে।

বেগম রোকেয়ার শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা ও কর্ম বিচার বিশ্লেষণ করলে তাতে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের নতুন নতুন মাত্রা স্পষ্ট হয়ে আসে। শিক্ষার মাধ্যমে নারীর সামাজিক উত্তরণে তাঁর বাস্তববাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি সে সময়কার বাস্তবতার নিরিখে বিস্ময়কর মনে হয়। তিনি শিক্ষাক্রমে সাধারণ বিষয়াবলির সাথে পুষ্টিবিদ্যা, পশুপালন, উদ্ভিদবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, উত্তাপতত্ত্ব প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করেন। এছাড়াও তিনি গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সূচি বিদ্যা, শুশ্রূষা প্রণালী, সন্তান লালন প্রণালী প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৪২] পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর জ্ঞান আহরণ করে নারীরা যাতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে লক্ষ্যে তিনি তা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি নানা যুক্তি-প্রমাণ দাঁড় করিয়েছেন। গৃহিণীদের ঘরকন্নার দৈনিক কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পাদন করবার জন্য বিশেষ জ্ঞান-বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। বাসগৃহের পরিবেশ সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত করা, পরিমিত ব্যয়ে সংসার পরিচালনা করার জন্য তিনি মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।[৪৩] স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য প্রস্তুত করতে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তিনি বলেছেন, "গৃহিণীর রন্ধন শিক্ষা

---

৪০. শামসুন নাহার মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০
৪১. ঐ. পৃ. ১২১
৪২. *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. ৪৫-৪৬
৪৩. ঐ. পৃ. ৪৬-৪৭

করা উচিত, একথা কে অস্বীকার করেন? একটা প্রবাদ আছে যে, স্ত্রীদের রান্না তাঁহাদের স্বামীর রুচি অনুসারে হয়। গৃহিণী যে খাদ্য প্রস্তুত করেন, তাহার উপর পরিবারস্থ সকলের জীবনধারণ নির্ভর করে। মূর্খ রাঁধুনীরা প্রায়ই 'কালাই' রহিত তাম্রপাত্রে দধি মিশ্রিত করিয়া যে কোর্মা প্রস্তুত করে, তাহা বিষ ভিন্ন আর কিছু নহে; মুসলমানেরা প্রায়ই অরুচি, ক্ষুধামান্দ্য ও অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া থাকেন, তাহার কারণ খাদ্যের দোষ ছাড়া আর কি হইতে পারে?"[৪৪] তিনি আরও বলেছেন, "রন্ধনপ্রণালীর সঙ্গে. সঙ্গে গৃহিণীর ডাক্তারী ও রসায়ন (Chemistry) বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান আবশ্যক। কোন্ খাদ্যের কি গুণ, কোন্ বস্তু কত সময়ে পরিপাক হয়, কোন ব্যক্তির নিমিত্ত কিরূপ আহার্য প্রয়োজন, এসব বিষয়ে গৃহিণীর জ্ঞান চাই। যদি আহারই যথাবিধি না হয়, তবে শরীরের পুষ্টি হইবে কিসের দ্বারা?"[৪৫] উত্তম সাংসারিক জীবনযাপনে আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন দিক কিভাবে জড়িত তা বুঝতে তিনি উল্লেখ করেছেন, "অনেকেই ছাগল, কুক্কুট, হংস, পারাবত ইত্যাদি পালন করেন, কিন্তু সেই সকল জন্তু পালন করিবার রীতি অনেকেই জানেন না। উহাদের নিমিত্ত নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র স্থান না থাকায় উহারা বাড়ীর মধ্যেই ঘুরিয়া চরিয়া বেড়ায়। কাজেই বাড়ীখানাকে পশুশালা বা পশুপাখীদের 'ময়লার ঘর' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহাতে এই জন্তুগুলি রুগ্ন না হইয়া হৃষ্টপুষ্ট থাকে এবং গৃহ নোঙ্গরা করিতে না পারে, তৎপ্রতি গৃহিণীর দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। উহাদের বাসস্থানও পরিষ্কৃত এবং হাওয়াদার (airy) হওয়া উচিত। নচেৎ রুগ্ন পশুপাখীর মাংস খাওয়ায় অনিষ্ট বই উপকার নাই। তবেই দেখা যায়, এক রন্ধন শিক্ষা করিতে যাইয়া আমাদিগকে উদ্ভিদবিজ্ঞান, রসায়ন ও উত্তাপতত্ত্ব (Horticulture, Chemistry ও Theory of Heat) শিখিতে হয়।"[৪৬] এভাবে পোষাক প্রস্তুত ও ব্যবহার, রোগে পীড়িতদের সেবাশুশ্রূষা, প্রতিবেশীদের প্রতি কর্তব্য পালন প্রভৃতি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্বের কথা তিনি বর্ণনা করেছেন। তবে সন্তান লালন পালনে মায়ের শিক্ষার বিষয়ে তিনি যা বলেছেন তাতে বিস্ময়বোধ জাগে। সন্তান পালনকে তিনি 'সর্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার' হিসেবে আখ্যাত করেছেন। এর গুরুত্ব তুলে ধরে বলেছেন, 'ইতিহাসে যত মহৎ লোকের নাম শুনা যায়, তাঁহারা প্রায় সকলেই সুমাতার পুত্র ছিলেন। .... শিশু স্বভাবত মাতাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে, তাঁহার কথা সহজে বিশ্বাস করে। মাতার প্রতি কার্য, প্রতি কথা শিশু অনুকরণ করিয়া থাকে। প্রতি ফোঁটা দুগ্ধের সহিত মাতার মনোগত ভাব

---

৪৪. ঐ. পৃ. ৪৮
৪৫. ঐ. পৃ. ৪৯
৪৬. ঐ. পৃ. ৫০

শিশুর মনে প্রবেশ করে।"[৪৭] এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, "মাতা ইচ্ছা করিলে শিশু-হৃদয়ের বৃত্তিগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া তাহাকে তেজস্বী, সাহসী, বীর, ধীর সবই করিতে পারেন। অনেক মাতা শিশুকে মিথ্যা বলিতে ও সত্য গোপন করিতে শিক্ষা দেয়, ভবিষ্যতে সেই পুত্রগণ ঠগ, জুয়াচোর হয়। অযোগ্যা মাতা কারণে-অকারণে প্রহার করিয়া শিশুর হৃদয় নিস্তেজ (spirit low) করে ..."[৪৮] তাঁর মতে, "মাতাই আমাদের প্রথম, প্রধান ও প্রকৃত শিক্ষায়িত্রী।"[৪৯] এখানে আধুনিক সামাজিক মনোবিজ্ঞান বিষয়ে বেগম রোকেয়ার জ্ঞানের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তুত বেগম রোকেয়া আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে আত্মিক বিকাশের সাথে বৈষয়িক ও ইহজাগতিক উন্নতি সাধন করে নারীর সমাজসত্তাকে বিকশিত করতে চেয়েছিলেন।

অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাত্রা বাড়ার সাথে সাথে রোকেয়ার ভেতর এই বোধের গভীরতা বেড়ে চলে। তাঁর জীবনের শেষ দশকের লেখাগুলোর অনেক ক্ষেত্রে এর ছাপ লক্ষ্য করা যায়। ১৩৩৭ সনে লেখা 'সুবেহ সাদেক'-এ তিনি উল্লেখ করেছেন, "অন্তত: পক্ষে বালিকাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতেই হইবে। শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি ; গোটা কতক পুস্তক পাঠ করিতে বা দু'ছত্র কবিতা লিখিতে পারা শিক্ষা নয়। আমি চাই সেই শিক্ষা - যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে, তাহাদিগকে আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ গৃহিণী এবং আদর্শ মাতা-রূপে গঠিত করিবে। শিক্ষা-মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই। তাহাদের জানা উচিত যে, তাহারা ইহজগতে কেবল সুদৃশ্য শাড়ী, ক্লিপ ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কার পরিয়া পুতুল সাজিবার জন্য আইসে নাই ; বরং তাহারা বিশেষ কর্তব্য সাধনের নিমিত্ত নারীরূপে জন্মলাভ করিয়াছে। তাহাদের জীবন শুধু পতি-দেবতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে। তাহারা যেন অন্নবস্ত্রের জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়।"[৫০] তৎকালীন সমাজে মুসলমানদের অধ:পতনের মূলে তিনি শিক্ষার অভাবকে দায়ী করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি 'রানী ভিখারিনী'-তে বলেছেন, "মুসলমানেরা স্বীকার করুন বা না করুন—তাঁহারা যে অযোগ্য, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, সুশিক্ষিতা-সুযোগ্যা মাতার গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা মুসলমানের ন্যায় অশিক্ষিতা অযোগ্যা মাতার গর্ভজাত সন্তান যে নিকৃষ্ট হইবে,

---

৪৭. ঐ. পৃ. ৫২
৪৮. ঐ. পৃ. ৫৩
৪৯. ঐ. পৃ. ৫৩
৫০. ঐ. পৃ. ২৯৯

ইহা ত অতি স্বাভাবিক। 'অযোগ্য' বলার জন্য রাগ না করিয়া 'যোগ্য' হইবার চেষ্টা করাই শ্রেয়।"[৫১]

রোকেয়া তাঁর 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে শিক্ষাকে বাস্তব জীবন সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে 'বিদ্যালয়, কর্মালয় এবং আতুরাশ্রম'-কে একীভূত করে 'তারিণী-ভবন'-এর কথা চিন্তা করেছেন। সাথে সাথে বিদ্যালয় বিভাগে ব্রাহ্ম, হিন্দু, খ্রিস্টান শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের কথা চিন্তা করে এবং তাঁহারা 'সকলে যেন এক মাতৃগর্ভজাত সহোদরার ন্যায় মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতেছেন' বলে ইউরোপীয় রেঁনেসাসীয় উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।[৫২] এ উপন্যাসে বিধৃত তাঁর শিক্ষাচিন্তা মানসের পরিচয়ে বিস্ময়মোধ না করে পারা যায় না। এখানেও তাঁর শিক্ষায় জীবনমুখীনতার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার বিষয় লক্ষ্য করা যায়। 'তারিণী ভবন'-এর শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "ছাত্রীদিগকে দুই পাতা পড়িতে শিখাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে ঢালিয়া বিলাসিতার পুত্তলিকা গঠিত করা হয় না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র-সবই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু শিক্ষার প্রণালী ভিন্ন। মিথ্যা ইতিহাস কণ্ঠস্থ করাইয়া তাহাদিগকে নিজের দেশ এবং দেশবাসীকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, চরিত্র-গঠন প্রভৃতি বিষয়ে অধিক মনোযোগ দান করা হয়। বালিকাদিগকে অতি উচ্চ আদর্শের সুকন্যা, সুগৃহিনী ও সুমাতা হইতে এবং দেশ ও ধর্মকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষতঃ তাহারা আত্ম-নির্ভরশীল হয় এবং ভবিষ্যৎ-জীবনে যেন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ পিতা ভ্রাতা বা স্বামী-পুত্রের গলগ্রহ না হয়, এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।"[৫৩] বস্তুত বেগম রোকেয়া 'তারিণী-ভবন' এর শিক্ষা বিভাগের আদলে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

তাঁর অন্যান্য লেখাতেও নারীর আত্মিক ও পার্থিব জীবন বিকাশকেন্দ্রিক বিষয়ের অস্তিত্ব ও বিস্তার লক্ষণীয়। এর সব কিছু এ ক্ষুদ্র পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব নয়। বস্তুত তিনি আধুনিক প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শনের অনুসারী ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয়ের ওপর জোর দিয়েছিলেন। নিজের মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন এক আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মননের ভিত্তি। তাই তাঁর লেখায় আকর ও উদাহরণ হিসেবে অনেকবারই আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যক্তি ও সমাজ প্রসঙ্গ এসেছে। তবে তাঁর সে মননের ভিত্তিটি ছিল নিজ সমাজ, নিজ দেশ ও তার মাটি। "..... কোনো সংকীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিলো না তাঁর মনে,

---

৫১. ঐ. পৃ. ২৯১-৯২
৫২. ঐ. পৃ. ৩২৯
৫৩. ঐ. পৃ. ৩২৯

কিন্তু তাঁর আন্তর্জাতিক মননের অর্থ ছিলো না আবার উন্মূলতা, শিকড়হীনতা বা বিচ্ছিন্নতা। তীব্রভাবেই যুক্ত ছিলেন তিনি স্বসমাজে ও স্বদেশে।"[৫৪]

বেগম রোকেয়ার শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা ও কর্ম বিশ্লেষণে যে জিনিষটা সব কিছুর ওপর স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো, নারীকে তিনি সমাজে নিজের স্থান করে নেওয়ার যোগ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে উগ্র নারীবাদের প্রকাশ কখনও ঘটেনি। 'Sultana's Dream' (সুলতানার স্বপ্ন) গ্রন্থে তিনি যে নারীপ্রধান সমাজের কথা চিন্তা করেছেন, তা নিছক স্বপ্ন। বস্তুত স্বপ্ন দেখলেও তিনি অতিমাত্রায় স্বপ্নবাদী ও তাত্ত্বিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রায়োগিক ও বাস্তববাদী। "নারী মুক্তির কোন দিকটি তাঁকে বেশি আলোড়িত করেছিল, তাত্ত্বিক দিকটি, নাকি তাঁর প্রায়োগিক রূপটি? তিনি সচেতন মানুষ ছিলেন, বাস্তববাদী ছিলেন।"[৫৫] তাই সমাজের উন্নতির জন্য পুরুষ ও নারীর সমান প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উপলব্ধি করেন। এ গভীর উপলব্ধিবোধ থেকে তাই তিনি বলেছেন, ".... আমরা সমাজেরই অর্ধ অঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির একপা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে – একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে — সর্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। প্রথমতঃ উন্নতির সাথে তাঁহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন — আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতির রাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন। তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন এবং জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে, তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী, সহকর্মিণী, সহধর্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য পুতুল জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই। একথা নিশ্চিত।"[৫৬] এখানে রোকেয়ার মধ্যে সমাজে নারী অধিকার, মর্যাদা, স্বার্থ ও ভূমিকার ক্ষেত্রেও সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির নিবিড়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নারীকে পুরুষের যোগ্য সঙ্গী ও

---

৫৪. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

৫৫. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, 'রোকেয়ার স্বপ্ন এবং বাস্তবতা', *আজকের কাগজ*, ঢাকা, ৩১ ভাদ্র, ১৪০১

৫৬. *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. ৩১

সহকর্মী করাই ছিল রোকেয়ার সকল চিন্তা ও কর্ম-প্রচেষ্টার সার লক্ষ্য। নারী সমাজে 'প্রকৃত শিক্ষা'র প্রসার ঘটিয়ে তিনি এ লক্ষ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন।

তাঁর লক্ষ্য যাতে বাস্তবে ফললাভ করে সেজন্য শিক্ষাপ্রসার কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে তিনি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' নামে মুসলিম মহিলা সমাজকল্যাণমূলক একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। যে সময় বাঙালি মুসলিম সমাজের পুরুষেরা পদ ও পদবী লাভের আশায় মোসাহেবিতে ব্যস্ত সে সময় একজন নারী হয়ে গেবম রোকেয়া প্রবল সাহস ও মনোবল নিয়ে সমাজ উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

এত কিছুর পরও বেগম রোকেয়ার মধ্যে গভীর দুঃখবোধ বিরাজমান ছিল। সমাজে নারীদের ঘনীভূত বঞ্চনা ও দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে তাঁর ভেতরে এ দুঃখবোধ সৃষ্টি হয়। এমন ত্যাগ নেই যা তিনি সমাজের জন্য করেননি। সমাজের মঙ্গলের জন্য তিনি অনেক কিছুর সাথে আপোসও করেছেন। যে অবরোধপ্রথাকে তিনি ঘৃণা করতেন তাকেও তিনি মাঝে মাঝে অবলম্বন করেছেন বাস্তব প্রয়োজনে।[৫৭] তারপরও তাঁর অন্তরের কান্না থামেনি। তারই বিশেষ বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলন' (Bengal Women's Educational Conference) - এ প্রদত্ত অভিভাষণে। আবেগপূর্ণ এ ভাষণে তিনি বলেন, "..... ২০/২১ বৎসর হইতে সাহিত্য ও সমাজ সেবা করিয়া - বিশেষতঃ ১৬ বৎসর যাবত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল পরিচালনা করিয়া যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি, তাহাই আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহস করিতেছি। স্ত্রী-শিক্ষার কথা বলিতে গেলেই আমাদের সামাজিক অবস্থার আলোচনা অনিবার্য হইয়া পড়ে। আর সামাজিক অবস্থার কথা বলিতে গেলে, নারীর প্রতি মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের অবহেলা, ঔদাস্য এবং অনুদার ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষপাত অনিবার্য হয়। ..... আপনারা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, আমি আজ ২২ বৎসর হইতে ভারতে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের জন্য রোদন করিতেছি। ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব কাহারা, জানেন? সে-জীব ভারত-নারী। এই জীবগুলির জন্য কখনও কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই। .... এখনও আমার সম্মুখে আমাদের স্কুলের কয়েকটি ছাত্রীর অভিভাবকের পত্র মজুত আছে - যাহাতে তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের মেয়েদের যেন সামান্য উর্দু ও কোরআন শরীফ পাঠ ছাড়া আর কিছু - বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া না হয়।"[৫৮] তৎকালীন বাঙালি সমাজে বিদ্যমান তমসাচ্ছন্ন, পশ্চাৎপদ, গতানুগতিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন

---

৫৭. মোতাহার হোসেন সুফী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮-২৯
৫৮. উদ্ধৃতি, ঐ, পৃ. ৩৯-৪০

মানসিকতা যা রোকেয়ার হৃদয়কে দুঃখ ভারাক্রান্ত করেছিল তার আরও প্রমাণ মেলে বেগম রোকেয়ার সহকর্মী ফাতেমা খানমের ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে আবুল ফজলকে লেখা এক চিঠি থেকে। তিনি লিখেছেন, "অলস অকর্মণ্য মুসলমান সমাজে নারীজাতির জন্য এই প্রবীণা বিধবা মহিলাটি যা করেছেন সমস্ত ভারতে (বৃটিশ-ভারতে) তার তুলনা নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙালী মুসলমানদের নিদ্রা তিনি কিছুতেই ভাঙ্গাতে পারছেন না। তাঁর স্কুলে তফসিরসহ কোরআন পাঠ থেকে আরম্ভ করে ইংরেজী, বাংলা, উর্দু, ফার্সী, হোম নার্সিং, ফার্স্ট এড, রন্ধন, সেলাই ইত্যাদি মেয়েদের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সমস্তই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমাঞ্চলের মেয়েরা আগ্রহে শিক্ষা করছে। কিন্তু বাঙ্গালীরা এদিকে ফিরেও চাচ্ছে না। ১১৪টি মেয়ের মধ্যে মাত্র দুইটা বাঙ্গালী। এখন বুঝতে পার বাংলার কি অবস্থা।"[৫৯] কি অচিন্তনীয় সে সামাজিক অন্ধকারময় পরিবেশ।

বেগম রোকেয়ার মনে তীব্র দুঃখবোধ ও ঘনীভূত বেদনার পাশাপাশি সুপ্ত প্রত্যাশাও ছিল। একদিন এ অন্ধকার কেটে যাবে। আজ তাঁর মৃত্যুর ৬৬ বছর পর শত বাধা বিপত্তির মধ্যেও সমাজের নারীর সামনের দিকে যাত্রা চলেছে। পুরুষের পাশাপাশি তাদের অবস্থানের মাত্রা ও গভীরতা ক্রমে বাড়ছে। তবে তা আরও বাড়া প্রয়োজন সমাজে নারীকে পুরুষের সমকক্ষতা অর্জনের জন্য, ঠিক যেমনটি আশা করেছিলেন বেগম রোকেয়া।

---

৫৯. ঐ. পৃ. ৪০